Subject : Bengali
Ph.D Course Work
Paper : II (Gabeshona Nibandha)
Paper No. : BNG 102
Unit : II (Gabeshona Nibandha Rachana)
Topic : Joruri Obostha O Nishiddo Kobita

জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) ও নিষিদ্ধ বাংলা কবিতা

মহর্ষি সরকার

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাতের দশকে ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ দীর্ঘ একুশ মাস ধরে চলতে থাকা এই জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নিয়েছিল। গ্রেপ্তার ও অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে দেশের সাধারণ মানুষকে এই জরুরি অবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ হয়েছিল সংবাদপত্র, বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, পত্রিকা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, গান, কবিতা, চিত্রনাট্য। আক্রান্ত হয়েছিল অসংখ্য নাটক। ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাব, *কলকাতা* পত্রিকা (বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা-১৯৭৫), কলকাতার সংবাদ *সাপ্তাহিক দর্পণ*-এর ৭৫-এর পূজা সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এমনকি *কৃত্তিবাস, অনীক, নন্দন, গণশক্তি, বাংলাদেশ, গণবার্তা, জন্মভূমি, পান্থ, মশাল, আত্রেয়ী* প্রভৃতি নানান পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো কবিতা পুরোপুরি বা আংশিক বাতিল হয়েছিল।[১] পাশাপাশি সেই সময় মণীশ ঘটক (১৯২০-১৯৭৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), কমলেশ সেন (১৯৩৭-২০০৬), শঙ্খ ঘোষ (জন্ম- ১৯৩২), সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫-২০১১), মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮-২০১৪), অঞ্জন কর (জন্ম- ১৯৩৯), শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় (জন্ম- ১৯৪৭), দীপক মজুমদার (১৯৩৪-১৯৯৩), পান্নালাল মল্লিক, বিদ্যুৎবরণ চক্রবর্তী, শম্ভু রক্ষিত প্রমুখ কবিদের কবিতাও সেন্সরের আওতায় পড়েছিল। অর্থাৎ এই সকল বিশিষ্ট বাঙালি কবিদের লেখায় এমন রোমহর্ষক কথা লুকিয়ে ছিল যা তৎকালীন শাসকদলের বা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির ভয়ের কারণ হয়েছিল। তাই রাষ্ট্রের আক্রমণ নেমে এসেছিল তাঁদের ওপর। গ্রেপ্তার ও অত্যাচার করা হয়েছিল অনেক কবি ও লেখকদের ওপর। কারণ সমকালীন জীবনের সন্ত্রাসের ছবি ফুটে উঠেছিল তাঁদের কবিতায়। তাঁরা চেয়েছিলেন সেই দুঃসহ সময়ের ছবি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তাই কবিতায় ছিল তাঁদের একমাত্র মাধ্যম। আর সেকারণেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধি ও তাঁর দলের লোকেদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তবে এই রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধ সত্ত্বেও বাংলা কবিতা লেখা হয়েছে। অনেক কবিতা সেন্সর হয়েছে, আবার নতুন লেখা তৈরিও হয়েছে।

তবে শুধুমাত্র কবিতা নয়, সেই সময় নিষিদ্ধ হয়েছিল সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের *নরক* ও কৃষ্ণ চক্রবর্তীর *অমানবিক* উপন্যাস, অচিন্ত্যকুমার সাঁতরার বেশ কিছু ছোটোগল্প, রবীন্দ্রসংগীত, হিন্দি চলচ্চিত্র *আঁধি, কিস্‌সা কুর্সি কা* ও *নাশবন্দি* প্রভৃতি। এইভাবে জরুরি অবস্থার সময় শিল্প-সাহিত্যের ওপর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে দিয়ে এক বিরাট ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ পেয়েছিল সেই সময়। ফলে সাধারণ মানুষ ছিল সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাই বলা যায়, ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

দুই.

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন সারা ভারতবর্ষে ঘোষিত জরুরি অবস্থা শুধুমাত্র শিল্প-সাহিত্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এমনটি নয়, সেইসঙ্গে সরকারি আদেশগুলিকে বিচারবিভাগের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল এবং বিনা বিচারে যেকোনো ব্যক্তিকে জেলে পুরে রাখার জন্য নতুন করে মিসা অর্ডিন্যান্স হিসেবে চালু হয়েছিল যা তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনবার সংশোধিত হয়েছিল। এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংগঠন ও জমায়েতের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার, বিক্ষোভ-প্রতিবাদের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক, কর্মচারী, খেতমজুর, কৃষক, সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে দূরে রাখা হয়েছিল মিসা, ডি. আই. আর ইত্যাদি আইনে গ্রেপ্তার ও জেলে পুলিশি অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে। বলাবাহুল্য, এক বিরাট পুলিশ-রাজ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই সময়। তবে এর প্রস্তুতি চলেছিল অনেক আগে থেকেই। ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকায় তাহলে দেখতে পাব, সাতের দশকের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ১৯৭৫-এর ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছিল। মূলত এই রায়ে শ্রীরাজনারায়ণ (১৯১৭-১৯৮৬)-এর আনা মামলায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি নির্বাচনে দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ৬ বৎসর পার্লামেন্টারি রাজনীতি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।[২] শুধু তাই নয়, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীজগমোহনলাল সিন্‌হা (১৯২০-২০০৮) রায়বেরিলি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার খারিজ করে দিয়েছিলেন। যাইহোক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর দিনই গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছিল এবং তাতে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল।[৩]

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর পর (১২ জুন, ১৯৭৫) সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি আদালতের রায় মেনে অন্য অনেকের মতো (অন্ধ্রের ছেনা রেড্ডি) মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। তাই ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ২০ দিনের স্টে-অর্ডার নেওয়া হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে কিছুটা সময় লাগবে, আর তাতেই দেখা গেল বিপত্তি। অপরদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি যাতে প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন এমন রায় পাওয়ার জন্য সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পদত্যাগের কথা শুনেই কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা এবং তাঁর পরিবারের লোকজনেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা শ্লোগান তুলে ছিলেন- 'ইন্দিরা ও ইণ্ডিয়া সমার্থক'। এইসব শ্লোগান এই কারণে তোলা হয়েছিল যে, ১৮-ই জুন কংগ্রেসের সংসদ দলের সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা হলেও কংগ্রেস দলের সদস্যরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিকে তাঁর উত্তরসূরি মনোনীত করার অধিকার দেয়নি। তাই ২০-এ জুন বোট ক্লাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির সভায় সারা দেশ থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এইজন্য ৭ হাজার ট্রাক ও বাসভাড়া করতে হয়েছিল (রণজিৎ রায়, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬

জুন)। ইতিমধ্যে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের ৪০০ জনের এক প্রতিনিধিদল শ্রীকৃষ্ণকুমার বিড়লা (১৯১৮-২০০৮)-র নেতৃত্বে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। অর্থাৎ এইভাবেই দেশে আইনের শাসনকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল।[৪]

যাইহোক, এলাহাবাদ নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলের মধ্যে কে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে বিরোধ চরমে উঠেছিল। কারণ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীজগজীবন রাম (১৯০৮-১৯৮৬) প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি তো কখনও ফিরে আসতে পারবেনই না, উপরন্তু মারুতি, স্টেট ব্যঙ্ক থেকে ৬০ লক্ষ টাকা অপসারণ ও নাগরওয়ালার মৃত্যু, তদন্তকারী একাধিক সি. বি. আই অফিসারের মৃত্যু, হিন্দুস্থান এলুমিনিয়ামের কাছে কয়েক লক্ষ টাকা নেওয়া, এক একটা নির্বাচনের আগে শিল্পপতি ও একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের নতুন নতুন লাইসেন্স দেওয়া, এল. এন. মিশ্র হত্যা প্রভৃতি বিষয়ে তদন্ত হত এবং শ্রীজগজীবন রাম এইসব দুর্নীতি তদন্তের দাবি চাপতে চাইতেন না, বরং দুর্নীতির তদন্তের ব্যবস্থা করে নিজের ইমেজ তৈরি করতেন। ১৯৭৫ সালের ২৪-এ জুন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি শ্রীবৈদ্যনাথপুরম আয়ার (১৯১৫-২০১৪) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিকে এলাহাবাদের হাইকোর্টের রায় থেকে শর্তহীন রেহাই দেননি। তাই তিনি রায় দিয়েছিলেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি লোকসভার সদস্য না থাকলেও প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। আর এই রায়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেন্টে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়েছিল। এর আগে মাত্র ৫ জন সদস্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৪ জুন রাত্রে সেই সংখ্যা ৩০ জন হয়েছিল। ২৫-এ জুন *হিন্দুস্থান টাইমস*-এ ছাপা হয়েছিল যে, ৩০ জন সদস্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, দুর্নীতির ছাপ পাওয়া প্রধানমন্ত্রীর দল ঠিক মতো কাজ করতে পারেনি। পরের দিন অর্থাৎ ২৫-এ জুন রাত্রে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ (১৯০২-১৯৭৯)-এর কাছে খবর গিয়েছিল ঐ সংখ্যা ৭৪ জনে পৌঁছেছে। এরপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি আর অপেক্ষা করতে পারেননি। কারণ, তিনি জানতেন যে, একবার তিনি ক্ষমতা থেকে সরে গেলে বিরোধী দল ও কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্ব তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক তদন্ত কমিশন বসাবে। তাই তিনি ভারতে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[৫]

আসলে একদিকে দেশের ক্রমবর্ধমান জন সংকট, জনগণের সংগঠিত ক্ষোভ ও আন্দোলন, অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা, শ্রমিক-কৃষকদের অসন্তোষ অন্যদিকে দলের মধ্যে আস্থাহীনতা এবং সর্বোপরি নিজের বিপুল ক্ষমতাপ্রীতি— এই সব কিছুর দাওয়াই হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি তাই করেছিলেন যা দেশে দেশে কালে কালে স্বৈরতান্ত্রিক ও ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়কেরা করে থাকেন। তাই দেখা যায়, ক্ষমতায় থাকার ভবিষ্যৎ তাঁর যতই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ততই তিনি ক্ষমতাই থাকতে চাইছিলেন। অর্থাৎ, নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তিনি এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে ভীত ও সন্ত্রস্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। আর সেই কারণে দলের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি যে স্বৈরতান্ত্রিক আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করে আসছিলেন সেটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল।[৬]

এমন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির পক্ষে কোনো কল্যাণকর নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, তাঁর বা তাঁর দলের শ্রেণিস্বার্থেই। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন মানুষের অধিকার হরণের রাস্তাটিকেই। ইতিমধ্যে ২৫-এ জুন "জয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লিতে অভিযোগ করেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ভারতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন এবং এজন্য জনসাধারণকে সতর্ক হতে বলেন" [*দি টাইমস (লন্ডন)* ২৭-

এ জুন ১৯৭৫]। সেই ২৫-এ জুন রাত্রেই শুরু হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে সি. পি. আই বাদে অন্য বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার। ২৬-এ জুন সকালে কেন্দ্রীয় বৈঠকের পর মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীফকিরুদ্দিন আলি আহমেদ (১৯৭৫-১৯৭৭) সংবিধানের ৩৫২ নং ধারার ১ উপধারা অনুসারে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বলেছিলেন—

a grave emergency exists whereby the security of India is threatend by internal disturbances.[৭]

এর ফলে ভারতের রাজনীতিতে স্বৈরতন্ত্র একটা পাকাপাকি ভিত্তি পেয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীফকিরুদ্দিন আলি আহমেদ (১৯০৫-১৯৭৭) ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর একটা 'রবার-স্ট্যাম্পমাত্র'।[৮]

তিন.

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থায় নিষিদ্ধ বাংলা কবিতার সংখ্যা অসংখ্য। তাই সীমিত পরিসরে সমস্ত কবিতা নিয়ে আলোচনা করা শুধু অসম্ভবই নয়, প্রায় দুঃসাধ্য। তাই আমরা নির্বাচিত কয়েকটি কবিতাকে সামনে রেখেই জরুরি অবস্থাকালে ভারতীয় রাজনীতির দৈন্য ও গ্লানি, প্রশাসনিক ব্যবস্থার গলদ, পুলিশি আক্রমণের অতিসক্রিয়তা ও অত্যাচার, ক্ষমতা দখল প্রভৃতি বিষয়গুলিকে দেখার চেষ্টা করব।

আলোচনার শুরুতেই বোম্মানা বিশ্বনাথম্ সম্পাদিত 'বাতিল কবিতা'[৯] সংকলন থেকে নির্বাচিত কতগুলি কবিতাকে আমরা বেছে নিয়েছি। সেই কবিতাগুলি হল— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ম্যাজিক', কমলেশ সেনের 'একী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা', শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'বন্ধুকে', সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'ডাইনির গান' প্রভৃতি। সেইসঙ্গে এই সংকলনে প্রকাশিত আরও কিছু নিষিদ্ধ কবিতাকে দেখে নেব যেগুলির মধ্যে জরুরি অবস্থার সময় কোনোটি পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়েছিল আবার কিছু কবিতা থেকে বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি, বাক্যবন্ধ এবং শব্দ বাতিল হয়েছিল।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮০) তাঁর 'ম্যাজিক'[১০] কবিতাটির মধ্যে দিয়ে স্বৈরাচারের স্বরূপকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আসলে জরুরি অবস্থা ও প্রেস সেন্সরশিপ মানুষের মুক্ত ভাবনা, মত প্রকাশ করা ও নিজ অধিকার মতো কাজ করার অধিকার পুরোপুরি হরণ করেছিল। তাই সেই অবস্থাকে বোঝাতে কবি বলেছেন—

> ঝড়ের মতোই সে এসে ঘরে ঢুকল। যে শৌখিন আয়নাটা প্রতিদিন ভোর না হতেই আমি নিজেকে আবিষ্কার করি; আমার সেই গভীর ভালোবাসার আয়নাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে সে এসে দাঁড়াল রূপকথার দৈত্যের মতো।
>
> তারপর শরীর থেকে একে একে তার চোখ, কান, মুখ, পায়ের পাতা, বুকের হাড়গুলি খুলে নিয়ে কিছুক্ষণ দু'হাতে লোফালুফি খেলতে লাগল সে। এক সময় হাতদুটিও অবশ হয়ে গেল, আর অবশিষ্ট অদ্ভুত জড়পিণ্ড থেকে বেড়িয়ে এল ভীষণ অস্বাভাবিক এক বোমা ফাটানো শব্দ : 'বলো তো আমি কীভাবে বেঁচে আছি?
>
> ('ম্যাজিক': বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

জরুরি অবস্থাও ঠিক এভাবেই ঝড়ের মতো মানুষের ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছিল এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করেছিল। এমনকি চলাচলের এবং সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলার অধিকারও তখন কারুর ছিল না। তাই এই অবস্থাকে কবির মনে হয়েছে – এ যেন মাথা, মুখ, জিহ্বা, হাত, পা, চোখ এমনকি হৃদয়টুকু কেড়ে নিয়ে একজন মানুষকে জড়পিণ্ড করে দেওয়া। তাই কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আয়নায় নিজের হাত-পা-

মুখ-মাথা হৃদয় ছাড়া জড়পিণ্ডের মতো মূর্তি দেখে চমকে উঠেছিলেন। এভাবেই তিনি খুলে দিয়েছিলেন স্বৈরাচারের স্বরূপ। এমনকি সমগ্র কবিতাটির মধ্যে দিয়েই তিনি আসলে জরুরি অবস্থার প্রভাব তথা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের 'ম্যাজিক'-টাকেই বড়ো করে তুলে ধরেছিলেন। সেকারণে *গণবার্তা* পত্রিকা থেকে পুরো কবিতাটি বাতিল করা হয়েছিল।[১১]

কবি কমলেশ সেন (১৯৩৭-২০০৬) তাঁর 'একী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা'[১২] কবিতাটির মধ্যে দিয়ে জরুরি অবস্থায় স্বৈরাচারের স্বরূপ, সাধারণ মানুষের মৃত্যু, কারাবন্দি ও অকথ্য নির্যাতনের ছবিকে খুব সহজ সরলভাবে তুলে ধরেছিলেন—

একী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা
হৃদয়তন্ত্রী কেঁপে কেঁপে ওঠা অশ্রু-সজল একী ভালবাসা
একী ভালবাসা সাঁজোয়া গাড়ির কামানের মুখে
গোলা বারুদ আর বন্দুকের মুখে
নিভাঁজ পথে, মানুষের চোরা চাহনির নীচে
একী ভালবাসা গভীর ভালবাসা।

... ...

চমকে ওঠা কৃপণের মুখে একী ভালবাসা
স্তব্ধ মানুষের নির্বাক চোখে একী ভালবাসা!

... ...

লাফিয়ে ওঠা মরণ যজ্ঞে একী ভালবাসা
নিহত জনের বুকের ক্ষতে একী ভালবাসা!

('একী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা': কমলেশ সেন)

কবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে, যত বাড়ে স্বৈরাচার, যত বাড়ে মৃত্যু, কারাবন্দি ও নির্যাতন- মানুষ তত স্বাধীনতা যোদ্ধার কাছে আসেন এবং তত ভালবাসেন। গলা-বারুদ-বন্দুক-সাঁজোয়া গাড়ি-খুনির কৃপাণ- সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায় মানুষের অসীম ভালোবাসার কাছে। তাই বিস্মিত শ্রদ্ধার মহা আনন্দে যোদ্ধা উচ্চারণ করেন- 'একী ভালবাসা, একী ভালবাসা!'। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মহোত্তম ও চূড়ান্ত মাত্রা পায় এতে, কারণ ইতিহাসে মানুষই শেষ কথা বলে। স্বৈরাচারও এটা জানে বলেই ভয় পায় স্বাধীনতার জন্য যোদ্ধার জন্য মানুষের অফুরান ভালবাসায়। সেকারণে *জন্মভূমি* পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতাটি সেন্সরশিপের জন্য পুরোটাই বাতিল হয়ে গিয়েছিল।[১৩] তবে একটি সহজ, অকৃত্রিম কবিতার জন্য স্বৈরাচারের এই আতঙ্ক অর্থহীন ছিল না বলেই মনে হয়।

কবি শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় (জন্ম— ১৯৪৭) মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বন্ধুকে'[১৪] কবিতাটির মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতকে (১৯৭৫-৭৭) একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। কবিতার প্রথমেই তাই তিনি বলেছেন—

লক্ষ্মী হও লক্ষ্মী হও
যা পড়াই তাই পড়
এবং নিয়ম মেনে চল।
আপাতত
অনুশাসন যোগ

এবং
এই তো সুযোগ।

('বন্ধুকে': শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়)

কবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে, জরুরি অবস্থা ও প্রেস সেন্সরশিপকে প্রচার করা হয়েছিল 'অনুশাসন পর্ব' নামে, কারণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর দলের চোখে ভারতবাসীরা সেই সময় প্রচণ্ড বিশৃঙ্খল এবং বেআদপ হয়ে পড়েছিলেন আর তাই তাঁদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা 'তোতাকাহিনি'র পাখিটির মতো দেশের মানুষকে খাঁচায় পুরে 'শিক্ষা দেওয়া'র পরিচ্ছন্ন আদপ কায়দা। তাছাড়া তখন সেটাই ছিল তাঁদের উপযুক্ত সময়। কবির ভাষায়—

সময়নিষ্ঠা আর শৃঙ্খলাবোধ
প্রশ্নহীন বাধ্যতায় ভানুমতি খেল-
হও নিরুদ্বেগ।

('বন্ধুকে': শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়)

'অনুশাসন পর্ব' হল দাসত্ব পর্বের আর এক নাম, 'প্রশ্নহীন বাধ্যতা'-র বাধ্যবাধকতা। অর্থাৎ সবকিছুকে চুপচাপ মেনে নেওয়া, কোনো কিছুর প্রতিবাদ না করা, সময়ের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে চলা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন কাটানো এটিই ছিল তখনকার নিয়ম। আর এর অনিয়ম হলেই তাঁদের ওপর নেমে আসত গ্রেপ্তার ও অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু এই নিয়ম বেশিদিন টেকেনি। কারণ—

আস্পর্ধা!
বাড়া ভাতে মুখ দিস
অসভ্য চড়ুই,
যা চলে জঙ্গলে যা
শহরে অযোগ্য তুই।

('বন্ধুকে': শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়)

বস্তুত, 'অনুশাসন পর্ব' সাধারণ মানুষকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেও তাঁদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখা সম্ভব নয়। কারণ এই ছন্নছাড়া চড়ুই-এর দল অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এসব মানে না, 'বাড়া ভাতে' মুখ দিয়ে সব আয়োজন পণ্ড করে— স্বৈরাচারও প্রতিহত হয়েছিল মানুষের কাছে, তাঁদের কাছে ছন্নছাড়া চড়ুইটির মতোই স্বাধীনতা ছাড়া কোনও নিয়ম নেই। অসাধারণ প্রতীক ও বক্রোক্তিতে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল কবিতাটিতে। যাইহোক স্বৈরাচার যে কবিতাটিকে সম্পূর্ণ বাতিল করবে তা জানাই ছিল এবং সত্যিই নিষিদ্ধ হয়েছিল।

কবি সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'ডাইনির গান'[১৫] কবিতাটিও নিষিদ্ধ তালিকায় স্থান পেয়েছিল। কারণ কবিতাটির প্রতিটি স্তবকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের ছবি ফুটে উঠেছিল। এমনকি কবিতার নামকরণের মধ্যে দিয়েও তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিকে কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা এবং আচরণকে 'ডাইনি'র সঙ্গে তুলনা করে কবিতার প্রথম স্তবকেই কবি জানিয়েছেন—

যা দিয়েছি তা নিয়ে সব থাক খুশি
নরমুণ্ডে ভরব নরক কুণ্ডটা
মুক্তিসূর্য এবং অসুরমর্দিনী

না বলে যে বলবে আমায় রাক্ষুসী

ধড় থেকে তার নামিয়ে দেব মুণ্ডটা।

('ডাইনির গান': সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

বাস্তবেও এই ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল ভারতবর্ষ। ১৯৭৫ সালের ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি স্বয়ং নির্বাচনে দুর্নীতি করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। এরপরেই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ২৫ জুন মাননীয় রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলী আহমেদকে দিয়ে জারি করলেন জরুরি অবস্থা। সমস্ত নির্বাচন স্থগিত, সংবাদমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা, বিরোধী নেতৃবৃন্দদের গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। তার ওপর শ্রীসঞ্জয় গান্ধির সক্রিয় পরিচালনায় চালু হয় বলপূর্বক নির্বীজকরণ কর্মসূচি। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম গণতন্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।[১৬] কবি সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতবাসীর এই গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ঘটনাকে ডাইনির কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাশাপাশি সেই সময় তাঁর কাজের বিরোধিতা করলে তাঁদের ওপরও যে নির্মম অত্যাচার নেমে আসত তার প্রমাণও কবি দিয়েছেন তাঁর কবিতায়—

বেশ করেছি ভাতার ঘরে থাকেনি
তবু তো কবি ডেকেছে 'প্রিয় দর্শিনী'
কল্‌জেটা তাঁর খেয়েছি নয় চিবিয়ে
তা বলবে যে বলবি ডেকে ডাকিনি
ফুৎকারে তাড় প্রাণটা দেব নিভিয়ে।

('ডাইনির গান': সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

কবি সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এখানে সরাসরি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর ক্ষমতার ঔদ্ধত্যকেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

জরুরি অবস্থার সময় দাবি উঠেছিল 'ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া'। পাশাপাশি ১৯৭৫ সালের ৩০ জুন 'মিসা' আইন কঠোরভাবে বলবৎ করা হয়েছিল। ফলে যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা যেতে পারত। এর বিরুদ্ধে আদালতে কোনও মামলা করা যেত না। ফলে সারা দেশ জুড়ে বহু রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা জেলে বন্দি অবস্থায় ছিলেন।[১৭] সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্তের মতো ব্যক্তিরা মিসায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে এই সময় শ্রীমতী গান্ধি বিশ দফা কর্মসূচী জারি করেছিলেন- যেগুলি ছিল কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ।[১৮] ভারতবাসীকে সেই নিয়ম মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। আর যারা এই নিয়ম মেনে জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন তাঁরা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সরকার তাঁদের প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। কবি সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় এই বিষয়গুলিকেই তুলে ধরেছেন—

গাইছে কোরাস 'ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া'
ভেরুয়া আর বিড়লা টাটা সিন্ধিয়া,
... ...
দেশটা আমার বাপের দেয়া যৌতুকই।
আমার পড়ে বসবে প্যাটের পোলাটা
মিসাটিসা সমাজবাদী কৌতুকই

হাস্যমুখে খাবে যে কান মোলাটা
বাণিজ্যে তার ভরিয়ে দেব ভরতুকি।

এই তো দিলাম বিশটি দফা ঝুমঝুমি
ঘুমাও সবাই না করে কেউ দুষ্টুমি
নরমুণ্ড গলায় আমার হরতুকি।

('ডাইনির গান'; সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

জরুরি অবস্থার সময় সরাসরি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনকে কটাক্ষ করে লেখা কবি সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'ডাইনের গান' কবিতাটি স্বাভাবিক ভাবেই মুখ্য সেন্সর দপ্তর থেকে বাতিল বলে গণ্য হয়েছিল।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্ সম্পাদিত 'বাতিল কবিতা' সংকলনে পুরোপুরি নিষিদ্ধ আরও বেশ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছিল। সেগুলি হল—

- কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— 'রবীন্দ্রনাথ যদি'[১৯]
- কবি দীপক মজুমদার— 'অদৃশ্য দর্পণে'[২০]
- কবি রমেন সরকার— 'অথচ'[২১]
- কবি মার্টিন কার্টার— 'এখন অন্ধকারের কাল আমার ভালোবাসা' (অনুবাদ- শ্যামসুন্দর দে)[২২]
- কবি গৌতম মিত্র— 'তিরিশের দশক পেরোলেই'[২৩]
- কবি শুভাশিস সান্যাল— 'প্রভাতের মোরগ'[২৪]
- কবি গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়— 'বিড়ম্বনা' [২৫]
- কবি ত্রিদিব ঘোষ রায়— 'নতুন দিনের আলো' [২৬]
- কবি রাধামোহন মোহান্ত— 'উটপাখির মন' [২৭]
- কবি নিমাই মান্না— 'সূর্যের রথ'[২৮]
- কবি অমল চক্রবর্তী— 'নিরাপত্তার ছড়া' [২৯]
- বোম্মানা বিশ্বনাথম— 'তাম্রপত্র' [৩০]

প্রকৃতপক্ষে সেন্সরশিপে বাতিল হওয়া কবিতার শব্দ, পঙক্তি, খণ্ড-পঙক্তিগুলি দেখায় যে কত নিরেট, কত আকাট ও দাম্ভিক ছিল জরুরি অবস্থার নামে সৃষ্ট সেই স্বৈরাচার। তার পছন্দ নয় এমন একটি পঙক্তি, বাক্যবন্ধ, শব্দ এমনকি বর্ণও ছাপা যেত না তখন। প্রাগুক্ত সংকলন থেকে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে।

❖ কবি দীপঙ্কর চক্রবর্তীর 'ছড়া'[৩১] কবিতার—

ওরে খোকন সোনা
বাঁশপাতা
চিকন পেটে গামছা বেঁধে এবার
শক্ত করো মন।

—এর 'পেটে গামছা বেঁধে'—কথাটি বাতিল হয়েছিল হয়ত এই কারণে যে কথাটির মধ্যে একধারে ক্ষুধা এবং ক্ষুধা সত্ত্বেও জেদ বোঝায় যদিও আমরা জানি যে উঠে পড়ে কোনও কাজে লাগা অর্থে কথাটি গ্রাম

বাংলায় খুব প্রচলিত।[৩২] যদিও পরবর্তীতে কবিতাটি *নন্দন* পত্রিকায় ফাল্গুন/চৈত্র ১৩৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৩]

- ❖ কবি নন্দদুলাল ভট্টাচার্যের 'তোমার যন্ত্রণা আমারো' [৩৪] কবিতায় 'হার্লেমের ক্ষুধার্ত শিশুরা' অক্ষুণ্ণ আছে কারণ তারা মার্কিন মুলুকের কালো বস্তির, কিন্তু 'কলকাতার দমদমের সেই মেয়েটির আশ্চর্য মুখ / শীর্ণ হাত তুলে ভিক্ষে করে রেল কামরায়'—এর 'কলকাতার দমদমের' কথাটি বাতিল করা হল এমন সূক্ষ্ম কায়দায় যে ছাপা হলে মনে হবে ঐ মেয়েটিও আমেরিকার 'হার্লেমের'।[৩৫]
- ❖ এমনভাবেই কবি শ্যামসুন্দর দে-র 'আয়ুধ সন্ধান'[৩৬] কবিতার নাম ও শেষ স্তবক বাতিল করা হয়েছিল। ফলে জরুরি অবস্থার সময় কবিতাটি অপ্রকাশিত থেকে যায়।[৩৭]
- ❖ কবি অনির্বাণ দত্তের 'মনোবল ধাত্রী হলে'[৩৮] কবিতার 'ভিয়েতনাম তৈরি হয়, হয়—এখানেই পুবে বা উত্তরে' পঙক্তিটির 'এখানেই' শব্দটি বাতিল হয়ে *নন্দন* পত্রিকায় ফাল্গুন/চৈত্র ১৩৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৯]
- ❖ কবি রাসবিহারী দত্তের 'এবং অবধারিত যুদ্ধজয়'[৪০] কবিতার প্রথম ও তৃতীয় স্তবক বাতিল হয়ে কবিতাটি *নন্দন* পত্রিকায় আষাঢ়/শ্রাবণ ১৩৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৪১]
- ❖ কবি ইয়া সরকারের 'যে রবসন গান গেয়েছিলেন'[৪২] কবিতার চতুর্থ পঙক্তির ('এইখানে এই কলকাতা জুড়ে জীবন জাগতে চায়') 'এইখানে এই' অংশটি বাতিল হয়ে *নন্দন* পত্রিকায় ফাল্গুন/চৈত্র ১৩৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৩]
- ❖ কবি পান্নালাল মল্লিকের 'মাগো তোমার বুকের কাছে'[৪৪] কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের কিছু লাইন বাতিল করা হয়েছিল—

...ক্রমে ফটো সংবাদের শিরোনামে
পৌঁছে যেতে... সংসদের কাব্য হতে হতে...
একদিন ঝরে পড়ে।

এই পঙক্তিগুলি বাতিল হয়ে কবিতাটি *নন্দন* পত্রিকায় কার্তিক ১৩৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৫]

- ❖ কবি শ্যাম সুন্দর সান্যালের 'তোমার পাখার দাপটে'[৪৬] কবিতার প্রথম ও তৃতীয় স্তবক বাতিল হয়েছিল।[৪৭]

চার.

জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে যে সকল কবি বা সাহিত্যিক কবিতা বা গদ্য লিখেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ (জন্ম—১৯৩২) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিশ শতকের ছয়ের দশকে তাঁর আবির্ভাব। তিনি ছিলেন *কৃত্তিবাস* পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তাঁর কবিতা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। মানবতাবাদী কবি শঙ্খ ঘোষ সংবেদনশীল মানসিকতা নিয়ে মানুষের জীবনকে দেখেছিলেন এবং অন্যায় যা কিছু দেখেছিলেন তার বিরুদ্ধেই সরব হয়েছিলেন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন যে, মানুষ জানুক দেশে জরুরি অবস্থা কী ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নিয়েছিল। সেই সময় তিনি দেখেছিলেন পুলিশের অতিসক্রিয়তা। কারণ যেকোনো প্রতিবাদের জন্যই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারত। তিনি শুনেছিলেন- 'বিনা সেন্সরে কিছুই ছাপা যাবে না আর'[৪৮]— এই ঘোষণার কথা। তিনি অবাক হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও কবিতাকে নিষিদ্ধ হতে দেখে। তাই তাঁর কাছে পুলিশি আক্রমণের চেয়েও

তখন লজ্জার আর ভয়ের মনে হয়েছিল 'মানুষের অটল ত্রাস এবং সশব্দে তার মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়াকে'।[৪৯] তিনি অপমান বোধ করেছিলেন সেই সময়। তাই বলেছিলেন—

> অপমান বোধ হয়, ভয় দেখিয়ে শাসন করবার এই লজ্জাহীন ফ্যসিস্ট আয়োজন দেখে। স্ট্র্যাটেজি হিসেবে অনেকে চুপ থাকতে চান সত্যি, কিন্তু প্রতিবাদে এগিয়ে এসে পুলিশের কাছে তাড়িতও হন অনেকে গোটা দেশজুড়ে। যে কোনো রকম ঝুঁকি নিয়ে কথা বলেন তাঁরা, দিল্লীর মসনদ কি জানে না যে প্রতিবাদীর এই সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলবে? অনিচ্ছুকের ওপর চাপ দিয়ে খুব বেশিদিন যে বাঁচে না ক্ষমতা, ইতিহাস কি তাকে শেখায়নি এটা?[৫০]

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর নিজের করা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই *বাবরের প্রার্থনা* কাব্যগ্রন্থের 'রাধাচূড়া'[৫১] কবিতাটি লিখেছিলেন। কবিতার প্রথমেই তিনি লিখেছিলেন—

মালী বলেছিল। সেইমত
টবে লাগিয়েছি রাধাচূড়া।
এতটুকু টবে এতটা গাছ?
সে কি হতে পারে? মালী বলে
হতে পারে যদি ঠিক জানো
কীভাবে বানায় গাছপালা।

('রাধাচূড়া': শঙ্খ ঘোষ)

কবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে, একজন মালী যেমন একটা রাধাচূড়া গাছকে একটি টবের মধ্যে লাগিয়ে বড়ো করতে চান ঠিক তেমনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি বা তাঁর দলও চেয়েছিল যে দেশের সমস্ত মানুষকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে রেখে তাঁদের ইচ্ছেমত চালনা করতে। অর্থাৎ, দেশের মানুষের চাওয়া, পাওয়া, সুখ, দুঃখ সব কিছু তারাই ঠিক করে দেবে। আর তা সম্ভব মূলত একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বা শৃঙ্খলা দ্বারা যা জরুরি অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয় সেই সময় সাধারণ মানুষের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার করা হতো তাও সমাজ সচেতন শিল্পী কবি শঙ্খ ঘোষের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাই সেই দৃশ্যকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি মালীর স্বগতোক্তিতে বলেছিলেন—

খুব যদি বাড় বেড়ে ওঠে
দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
থেকে যাবে ঠিক ঠাণ্ডা চুপ-
ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে
লোকেও বলবে রাধাচূড়া !

('রাধাচূড়া': শঙ্খ ঘোষ)

অর্থাৎ, দেশের সাধারণ মানুষ যদি তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে চায়, তাঁরা যদি তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া সীমানা অতিক্রম করে তাহলে গ্রেপ্তার ও অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁদের সেই বেড়ে ওঠার ইচ্ছাকে ছেঁটে দিতে হবে এবং সেই ভয়েই মানুষ শান্ত হয়ে থাকবে। থাকবে না চারদিকে কোনো অশান্তি। তখন সবাই বলবে যে দেশে সুন্দর ও সুস্থির পরিবেশ বজায় আছে। ঠিক যেমন ছেঁটে দেওয়া রাধাচূড়া শোভা পাই সেই

রকম। আর সেইসময় দেশে এইরকম পরিস্থিতিই তৈরি হয়েছিল। এরপরেই কবি শঙ্খ ঘোষ আসল কথাটি বলেছেন। আর তা হল—

সব বলেছিল ঠিক, শুধু
মালী যা বলেনি সেটা হলো
সেই বাড় নিচে চারিয়ে যায়
শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে, আর
এখানে ওখানে মাটি ফুঁড়ে

হয়ে ওঠে এক অন্য গাছ।

('রাধাচূড়া': শঙ্খ ঘোষ)

কবির মতে, রাধাচূড়া গাছটাকে ওপরে বাড়তে না দেওয়ার কারণে যেমন শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে এবং তাঁর ফলে এখানে ওখানে মাটি ভেদ করে এক অন্য গাছ তৈরি হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ছিন্ন করে তাদেরকে একটা নিয়মের বেড়াজালে বন্দি করে রাখার ফলে ভিতরে ভিতরে একটা প্রতিবাদ জমে ওঠে, তাঁরা সংঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করে, আর তখনই জন্ম নেয় আর এক প্রতিবাদী মানুষ। তাঁদের কথা বলতে গিয়ে কবি জানিয়েছেন—

এমনকি সেই মরশুমি টব
ইতস্ততের চোরা টানে
বড়ো মাথা ছেড়ে ছোটো মাথায়
কাতারে কাতারে ঝেঁপে আসায়
ফেটে যেতে পারে হঠাৎ যে
সেকথা কি মালী বলেছিল?
মালী তা বলেনি, রাধাচূড়া!

('রাধাচূড়া': শঙ্খ ঘোষ)

আসলে রাধাচূড়া গাছটিকে বাড়তে না দেওয়ায় তারা ঝাঁপালো হতে হতে একসময় টব ফেটে বেরিয়ে আসতে চাই— কারণ ঐ ছোটো একটু টবে তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক সেই রকম জরুরি অবস্থায় গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুলিশি গ্রেপ্তার ও অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও তাঁদের ভিতরে ভিতরে যে প্রতিবাদ জমে উঠেছিল তা একসময় বিশাল আকার ধারণ করেছিল এবং পরবর্তীকালে সকল প্রতিরোধ বা নিয়মের বেড়ি ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। আসলে অনিচ্ছুকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে খুব বেশিদিন যে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না তা তৎকালীন ইন্দিরা সরকার বুঝতে পারেননি। তাই যতদিন গেছে তাঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তত বেশি জমে উঠেছিল এবং টব ফেটে যাওয়ার মতো সেই নিয়মের বন্ধনও একসময় ছিঁড়ে গিয়েছিল যা কবি শঙ্খ ঘোষ খুব কাছ দেখেছিলেন। এমনকি তাঁর লেখার মধ্যেও সেই ছবি ফুটে উঠেছিল। আর সেকারণে তাঁর এই কবিতাটি ফিরে এসেছিল 'নট টু বি প্রিন্টেড' এই সরকারি শিলমোহর নিয়ে। যদিও পরবর্তীতে শর্ত মেনে কবিতাটি *লা পোয়েজি* এবং *সাহিত্যপত্র* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৫২]

পাঁচ.

একজন প্রকৃত সৎ ও শক্তিশালী কবি ঐ ৭৬-এর দুঃসহ দিনগুলিতেও কীভাবে জ্বালাতে পারেন পৌরুষ ও প্রতিবাদের আগুন এবং অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে কিভাবে দেখতে পারেন স্বাধীনতার শত্রু ও তাঁদের স্তাবকদের অনিবার্য পরিণাম, তারই অসাধারণ দৃষ্টান্ত অঞ্জন করের (১৯৩৯) 'ছিয়াত্তরের দুঃসহ দিনগুলিতে'[৫৩] কবিতাটি। পান্নালাল মল্লিক সম্পাদিত *স্বদেশ* পত্রিকার অক্টোবর ২০০৪ সংখ্যায় এই নিষিদ্ধ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কবির ভাষায়—

মুখে লাগাম এঁটে বসে থাকো ক্রীতদাস, ক্রীতদাসীর দল,
সারা ভারতবর্ষ তছনছ ক'রে যারা বানাচ্ছে সাহারা
তোমার মুখের ভাষা ও পেটের গ্রাস নিচ্ছে কেড়ে
তাদের দু'হাত তুলে সাজাচ্ছো অঞ্জলি
তোমাদের মৃত্যুর নৈবেদ্য এভাবেই তৈরি হ'চ্ছে
ইতিহাস প্রমাণ ক'রেছে- তোমরা ভীরু ক্লীব ছাড়া কিছু নও
ভাগাড় জঞ্জালও বাসিফুলের মতো
তোমাদের বিদ্রুপ ছড়াবে!

('ছিয়াত্তরের দুঃসহ দিনগুলিতে': অঞ্জন কর)

কবি এখানে জরুরি অবস্থার কাছে যারা নতিস্বীকার করেছিল, যারা ছিল ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং যাদের প্রতিবাদের ভাষা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁদেরকে নতুন উদ্যমে জেগে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে মানুষই শেষ কথা বলবে। তাই সেই মানুষকেই তিনি 'ভীরু', 'ক্লীব' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করে তাদেরকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

দীপক মজুমদারের 'জবানবন্দি'[৫৪] কবিতাটি *কলকাতা* (১ম রাজনীতি সংখ্যা- ১৯৭৫) পত্রিকায় প্রকাশিত মানোলিস আনাগনস্তাকিসের (জন্ম-১৯২৫ সাল, উত্তর গ্রীস) লেখা একটি গ্রীক কবিতার অনুবাদ, যার মধ্যে দিয়ে কবি দীপক মজুমদার সেই দুঃসময়ের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছিলেন এবং এদিক থেকে তিনি অনুবাদক হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

কবি দীপক মজুমদার অনুবাদিত মানোলিস আনাগনস্তাকিসের লেখা এই গ্রীক কবিতাটি আলোচনা করার আগে আমরা তাঁর সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। বস্তুত, তাঁর এই কবিতাটি ১৯৭০ সালে লেখা হয়েছিল এবং তখন গ্রীস সামরিক একনায়কতন্ত্রের অধীন ছিল। আর তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯২৫ সালে উত্তর গ্রীসের রুক্ষ ঘরপোড়া মাখিদোনিয়া অঞ্চলের তীক্ষ্ণবন্দর শহর সালোনিকায়। তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এবং এই নিয়ে অনেক কবিতাও তিনি লিখেছিলেন। এইজন্য গ্রীসের সেনাপতিরা তাঁকে নানাভাবে ভয় দেখিয়েছিল এবং তাঁর ওপর অত্যাচার করেছিল।

এবারে আমরা কবি দীপক মজুমদার অনুবাদিত 'জবানবন্দি' নামক গ্রীক কবিতাটি সামনে রেখে দেখার চেষ্টা করবো যে, কী কারণে তা তৎকালীন শ্রীমতী ইন্দিরা সরকারের রোষের কারণ হয়েছিল এবং পত্রিকা সমেত কবিতাটি নিষিদ্ধ তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

'জবানবন্দি' কবিতাটির নাম শুনলেই বোঝা যায় যে, কবিতাটির মধ্যে কোনো সত্য কথা জোর গলায় বলা হচ্ছে। তাই কবি লিখেছেন—

'আমি সেইসব কবিতা লিখি যারা রাষ্ট্রের মতিগতি বুঝে চলে

আর যাদের মধ্যে মুক্তি গনতন্ত্র ইত্যাদি শব্দ নেই
যারা চীৎকার করে ওঠে না
ধ্বংস হোক স্বেচ্ছাচারিতার, মৃত্যু হোক দেশদ্রোহীদের'।

('জবানবন্দি': দীপক মজুমদার)

অর্থাৎ, কবি তাঁদের নিয়েই কবিতা লেখেন যারা রাষ্ট্রের কথায় চলে এবং তাঁদের মতিগতি বুঝে চলে। আর এই ধরণের ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো মুক্তি, গণতন্ত্র ইত্যাদি কোনো শব্দ থাকে না। তাঁরা চীৎকার করে ওঠে না কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এককথায় তাঁরা রাষ্ট্রের তাঁবেদারি করে। তাই কবি চেয়েছেন যে, স্বেচ্ছাচারিতা ধ্বংস হোক এবং মৃত্যু হোক দেশদ্রোহীদের। কারণ তাঁদের জন্যই দেশের আজ এই দুরাবস্থা। কবি আরও বলেছেন—

'সতর্কভাবে এড়িয়ে চলি তথাকথিত দাহ্য তথ্যগুলি'

('জবানবন্দি': দীপক মজুমদার)

কারণ, যে কবিতা পড়ে দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হতে পারে বা এককথায় দেশে আগুন জ্বলে উঠতে পারে এমন কবিতা লিখলে তা সেন্সর তো হবেই তাঁর ওপর জুটবে অত্যাচার। আসলে কবি এখানে ব্যঙ্গ করে একথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সাহিত্যের ওপর রাষ্ট্রের যে নিষেধাজ্ঞা পুরোদমে বজায় ছিল তাকেও দেখাতে চেয়েছেন। কবি জানিয়েছেন—

'আমি কবিতা লিখি ঠাণ্ডা মাথায়, আরামে
সবরকম সেন্সরের মধ্যে'

('জবানবন্দি': দীপক মজুমদার)

কারণ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো কিছু না লিখে যদি তাঁর পক্ষে কোনো সাহিত্য বা রচনা লেখা হয় তবে তার ওপর কোনো সেন্সরের কোপ পড়ে না। আর এইভাবেই রাষ্ট্রের গোলামি করে অনেকে টিকে থাকেন কিন্তু কবি তা চান না। তাই ব্যঙ্গ করে কবি একথা বলেছেন। আসলে জরুরি অবস্থাতেও ঠিক এই ঘটনায় ঘটেছিল যা কবি দীপক মজুমদার নিজের চোখে দেখেছিলেন। তাই সেই ঘটনাকে এত সুন্দরভাবে তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন।

কবিতা লেখার ক্ষেত্রে তিনি কোন শব্দ ব্যবহার করবেন তা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। তাই তিনি বলেছেন—

'আমার ঘেন্না ধরে এইসব ক্ষয়ে যাওয়া অভিব্যক্তি শুনলে
যেমন, অন্তঃসারশূন্য, পচা, পুতিগন্ধময় বজ্জাতের দল,
কিম্বা ওরা বেশ্যাবৃত্তি করছে।'

('জবানবন্দি': দীপক মজুমদার)

সেকারণে প্রতিটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিতে চান—

'নিখুঁত অনিবার্য সেই শব্দটিকে
যাকে বলা যায় কাব্যগুণান্বিত, চিক্কন, কুমারী স্বভাব
কিম্বা আরো ভালো- ভাবসুন্দর।'

('জবানবন্দি': দীপক মজুমদার)

আর এই সকল শব্দের সমন্বয়ে তিনি সেইসব কবিতা লেখেন যারা কখনোই- 'কোনো প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না'। অর্থাৎ, কোনো কিছু পাওয়ার লোভে তাঁরা সবকিছুকে মেনে নেয় ও মানিয়ে নেয়। কোনো

কঠিন নিয়মের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদও তাঁদের আসে না। তাই কবি এঁদের প্রতি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আসলে গ্রীক কবি মানোলিস আনাগনস্তাকিস তাঁর এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতাকে আক্রমণ করতে চেয়েছেন যা অনুবাদক দীপক মজুমদার তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সেকারণে এই কবিতাটি সরকারের ভয়ের কারণ হয়েছিল এবং পত্রিকা সমেত নিষিদ্ধ হয়েছিল।

ছয়.

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭)-কে কেন্দ্র করে লেখা বাংলা কবিতাগুলির বিশ্লেষণের পর একথা বলা যায় যে, উত্তাল সময়ের নিরিখে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে শিল্পী- সাহিত্যিকরা আসলে স্বৈরাচারী শক্তির ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। কারণ তৎকালীন সময়ের আলোড়িত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দিশাহীন অবস্থাকে তাঁরা প্রায় কেউ-ই অস্বীকার করতে পারেননি। তাই সেই ধ্বস্ত সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লেখার মাধ্যমে তাঁরা যেমন একদিকে ভয়ঙ্কর সময়কে তুলে ধরেছিলেন, অন্যদিকে অসহায় মানুষকে দেখিয়েছিলেন শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির স্বপ্ন। আমরা সেকারণেই তাঁদের সৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে বারেবারে প্রতিবাদের স্বর ফুটে উঠতে দেখি। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কারণ জরুরি অবস্থায় অধিকাংশ কবিতা নিষিদ্ধ হয়েছিল। স্বৈরাচারী শক্তির পছন্দ নয় এমন পঙক্তি, বাক্যবন্ধ, শব্দ এমনকি বর্ণও ছাপা যেত না সেইসময়। কিন্তু তাঁরা যে পথ দেখিয়েছিলেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিবাদী সাহিত্য লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অবশ্য কমিটেড লেখকের কাজই তো এটা। তাঁরাই তো পারেন উত্তাল সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখর হতে। সময় ও সময়ের ক্রমপাঠকে ধারণ করে আছে যে শিল্পসাহিত্য— অতিক্রান্ত সময়ের ব্যবধানে আমরা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সেই সময়কে অনুধাবন করতে চেয়েছি। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে আমরা সাতের দশকের জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-৭৭) সময় নিষিদ্ধ বাংলা কবিতার বিশ্লেষণে সচেষ্ট থেকেছি।

তথ্যসূত্র

১. দত্ত, সন্দীপ, 'ভারতীয় সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস', তাপস চক্রবর্তী (সম্পাদক), *ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ (সংযোজিত ও পুনর্মুদ্রিত)*, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ. পি. ডি. আর), কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ: জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ৩৪ (পরিশিষ্ট— ৯)

২. মণ্ডল, রবীন, 'ত্রস্ত আইন প্রণয়ন', জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার প্রথম রাজনীতি সংখ্যা (বর্ষা-১৯৭৫), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলিকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ৬৯

৩. বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৬, পৃষ্ঠা. ৩২৯-৩৩০

৪. দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ, 'কয়েকটি তথ্য', জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার প্রথম রাজনীতি সংখ্যা (বর্ষা-১৯৭৫), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলিকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ২০-২১

৫. ঐ, পৃষ্ঠা. ২২-২৩

৬. বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৬, পৃষ্ঠা. ৩৩০

৭. দাশগুপ্ত, রামকৃষ্ণ, 'কয়েকটি তথ্য', জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার প্রথম রাজনীতি সংখ্যা (বর্ষা-১৯৭৫), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলিকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ৯

৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ১০

৯. বিশ্বনাথম্, বোম্মানা (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৫৩]

১০. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, 'ম্যাজিক', বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭৪]

১১. ভট্টাচার্য, শম্ভু, *মানব সম্পর্কের কবিতা*, এডুকেশন সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩২৫

১২. সেন, কমলেশ, 'একী ভালবাসা, গভীর ভালবাসা', বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৫৭]

১৩. ভট্টাচার্য, শম্ভু, *মানব সম্পর্কের কবিতা*, এডুকেশন সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩২৬

১৪. মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর, 'বন্ধুকে', বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৫৮]

১৫. মুখোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন, 'ডাইনির গান', বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৬৮]

১৬. 'নব যুগবার্তা', *রবিবারোয়ারি, এই সময়*, কলকাতা, রবিবার ২৬ নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৫

১৭. দাস, অরূপ কুমার (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণযুগের দিনপঞ্জি (১৯৬০-১৯৭৯)*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জুন, ২০০১, পৃষ্ঠা. ৮১

১৮. সেনগুপ্ত, বরুণ, *ইন্দিরা একাদশী, বরুণ সেনগুপ্ত রচনা সংগ্রহ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ- ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা. ৫৭৩

১৯. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, 'রবীন্দ্রনাথ যদি', বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৫৫]

২০. মজুমদার, দীপক, 'অদৃশ্য দর্পণে', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৬০

২১. সরকার, রমেন, 'অথচ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৬১

২২. কার্টার, মার্টিন, 'এখন অন্ধকারের কাল আমার ভালোবাসা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৬৬

২৩. মিত্র, গৌতম, 'তিরিশের দশক পেরোলেই', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৬৯

২৪. সান্যাল, শুভাশিস, 'প্রভাতের মোরগ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭০

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, গণপতি, 'বিড়ম্বনা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭০

২৬. রায়, ত্রিদিব ঘোষ, 'নতুন দিনের আলো', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭১

২৭. মোহান্ত, রাধামোহন, উটপাখির মন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭২

২৮. মান্না, নিমাই, 'সূর্যের রথ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭২

২৯. চক্রবর্তী, অমল, 'নিরাপত্তার ছড়া', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭৩

৩০. বিশ্বনাথম্, বোম্মানা 'তাম্রপত্র', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭৫

৩১. চক্রবর্তী, দীপংকর, 'ছড়া', বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৬২]

৩২. ভট্টাচার্য, শম্ভু, *মানব সম্পর্কের কবিতা*, এডুকেশন সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩২৯

৩৩. বিশ্বনাথম্, বোম্মানা (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৬২]

৩৪. ভট্টাচার্য, নন্দদুলাল, 'তোমার যন্ত্রণা আমারো' বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৬৩]

৩৫. ভট্টাচার্য, শম্ভু, *মানব সম্পর্কের কবিতা*, এডুকেশন সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩২৯

৩৬. দে, শ্যামসুন্দর, 'আয়ুধ সন্ধান', বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৫৭]

৩৭. বিশ্বনাথম্, বোম্মানা (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৫৭]

৩৮. দত্ত, অনির্বাণ, 'মনোবল ধাত্রী হলে', বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৬৪]

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৬৪

৪০. দত্ত, রাসবিহারী, ‘এবং অবধারিত যুদ্ধজয়’, বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৫৯]

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৫৯

৪২. সরকার, ইয়া, ‘যে রবসন গান গেয়েছিলেন’, বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৬৫]

৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৬৫

৪৪. মল্লিক, পান্নালাল, ‘মাগো তোমার বুকের কাছে’, বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৬৫]

৪৫. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৬৬

৪৬. সান্যাল, শ্যাম সুন্দর, ‘তোমার পাখার দাপটে’, বোম্মানা বিশ্বনাথম্, (সম্পাদক), *বাতিল কবিতা*, ২৫ শে মাঘ ১৩৮৪ [উৎস- রাহুল পুরকায়স্থ (সংকলন ও সম্পাদনা), *বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা*, ধানসিড়ি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৩৬৭]

৪৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৬৭

৪৮. ঘোষ, শঙ্খ, *কবিতার মুহূর্ত*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১০, পৃষ্ঠা. ৬৩

৪৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ৬৩

৫০. ঐ, ৬৩

৫১. ঘোষ, শঙ্খ, ‘রাধাচূড়া’, *কবিতার মুহূর্ত*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১০, পৃষ্ঠা. ৬৫

৫২. ঘোষ, শঙ্খ, *কবিতার মুহূর্ত*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১০, পৃষ্ঠা. পৃষ্ঠা. ৬৮

৫৩. কর, অঞ্জন, ‘ছিয়াত্তরের দুঃসহ দিনগুলিতে’, শম্ভু ভট্টাচার্য, *মানব সম্পর্কের কবিতা*, এডুকেশন সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩৩০

৫৪. মজুমদার, দীপক, ‘জবানবন্দি’, জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার প্রথম রাজনীতি সংখ্যা (বর্ষা-১৯৭৫), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলিকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ৪৯